৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭০

গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকা এক অভূতপূর্ব ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। উপদ্রুত এলাকায় যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মানবজীবন, গবাদিপশু ও সম্পদের যে বিপুল পরিমাণ বিনাশ হয়েছে, তা পৃথিবীর কোথাও কখনও হয়েছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ নেই।

এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনার পর যারা জীবিত রয়েছে, তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য সম্ভব সব কিছুই করা হচ্ছে। দুর্গতদের জন্য খাদ্য, ঔষধপত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছেন। কাজটা যদিও খুবই বিরাট, তবু আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে সর্বাধিক দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জনগণ তাদের ভাইদের দুঃখে উদারভাবে সাড়া দিয়েছেন দেখেও আমি আনন্দিত। এই দুর্যোগের দিনে আমাদের প্রতি বিশ্বব্যাপী যে সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে, তাতে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও উদারতার সঙ্গে সাহায্য দান করতে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। আমাদের সংকটকালে আমরা বিশ্বের সব দেশ, বিশ্বের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এজেন্সীর কাছ থেকে যে সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছি, সেজন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আসুন, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লার কাছে মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদের ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করেন।

এখন আমি আসন্ন নির্বাচন প্রসংগে দু'একটি কথা বলতে চাই। ১৯৬৯ সালের মার্চ থেকে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। আমার সর্বপ্রথম সুযোগেই আমি আপনাদের জানিয়েছিলাম যে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এজন্যে যে আজ থেকে মাত্র চার দিনের মধ্যে আমরা আমাদের দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পৌঁছব। আপনারা সকলেই জানেন, গত এক বছর আট মাস ধরে আমাদের অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সরকার ও জনগণ বদ্ধপরিকর হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে কর্তব্য পালন না করলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম না।

বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সংকল্পে অটল ছিলাম। আমাদের এই সংকল্প হচ্ছে: দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ এখন সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

জাতি চিরস্থায়ী; চিরস্থায়িতার মূল্য, সম্মান ও আদর্শ। লোক আসে, আবার চলে যায়; কিন্তু জাতি, ইনশা আল্লাহ, বেঁচে থাকবে চিরকাল। যাঁরা জাতীয় পরিষদের নির্বাচনপ্রার্থী, তাঁদের প্রতি আমি কিছু বলতে চাই। তাঁরা যেন এটা উপলব্ধি করেন যে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের প্রথম কর্তব্য হবে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। এই কর্তব্য সার্থকভাবে সম্পন্ন করার জন্যে প্রয়োজন হবে অপরিসীম ধৈর্য ও অসাধারণ প্রজ্ঞা। কাজেই তাঁরা যেন অবশ্যই নম্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিরাট ও

মহৎ কর্তব্য পালনে ব্রতী হন। জনগণ ভোট দিয়ে তাঁদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন;—জনগণের স্বার্থে তাঁরা যেন নিজেদের উৎসর্গ করেন।

এই উপলক্ষে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূলতঃ সামরিক আইনের আওতাভুক্ত আইনকাঠামো আদেশের অধীনে। নির্বাচন কেবলমাত্র প্রথম পর্যায়। পরবর্তী পর্যায় হবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। আর চূড়ান্ত পর্যায় হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। সার্বভৌমত্ব জাতীয় পরিষদের হাতে ন্যস্ত হবে তখনই—যখন এই চূড়ান্ত পর্যায় সমাপ্ত হবে এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।

বলা বাহুল্য, সমগ্র কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হিসেবে বলবৎ থাকবে।

আমি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতাদের, একটা পরামর্শ দিতে চাই। তাঁরা যদি একত্র মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে একমত হতে পারেন—তাহলে তাঁরা নির্বাচনের পর থেকে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজন হবে আদান-প্রদানের মনোভাব, পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণের অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি।

১লা মার্চ, ১৯৭১

আজ পাকিস্তান কঠিনতম রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে, এবং বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্য আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই—তা আপনাদের জানানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তবে, এদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হওয়ার পর থেকে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমি কী-কী ব্যবস্থা করেছি—তা আপনাদের কাছে আগে বলে নিতে চাই।

জাতির উদ্দেশে আমার সর্বপ্রথম ভাষণে আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলাম। তখন থেকে আমরা এই উদ্দেশ্য অর্জনের পথে পদেপদে এগিয়ে গেছি। দেশে সামরিক আইন জারী থাকা সত্ত্বেও, আমি রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করিনি; বরং প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পূর্ণাংগ রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দিয়েছি।

এরপর ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা রূপে প্রকাশিত হোলো আইনকাঠামো আদেশ। নির্বাচনী এলাকার সীমা-নির্ধারণ, ভোটার তালিকার প্রস্তুতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হোলো। দীর্ঘদিন ধ'রে তুমুল নির্বাচনী অভিযান চললো। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, এই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করলো পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ শান্তিপূর্ণ ও

সুশৃংখলভাবে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন। আপনারা জানেন, নির্বাচন চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ হোলো ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী।

নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে, জাতির উদ্দেশে আমার ভাষণে আমি রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলাম যে তাঁরা যদি একত্র মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে একমত হতে পারেন—তাহলে তাঁরা নির্বাচনের পর থেকে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। তখন আমি একথাও ব'লেছিলাম যে আলাপ-আলোচনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হবে আদান-প্রদানের মনোভাব, পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং জাতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণের অশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত-বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বিবেচনা করে, আমি এ কাজের সুবিধের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে চেষ্টা করলাম। কাজেই আমি জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য ধার্য করলাম মার্চ মাসের ৩ তারিখ।

গত কয়েক সপ্তাহে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের কোন কোন নেতা, একমত হওয়ার পরিবর্তে অবলম্বন করেছেন অনমনীয় মনোভাব। এটা চরম দুর্ভাগ্যজনক। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে এক শোচনীয় পরিস্থিতি; আর তা জাতির ওপর বিস্তার করেছে বিষাদের ছায়া।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে এই: পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল—অর্থাৎ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, এবং অন্য আরও কয়েকটি দল—১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অসম্মতির কথা ঘোষণা করেছেন। এছাড়া, হিন্দুস্তান যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, তার ফলে সমগ্র পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। কাজেই, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী একটি তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

আমি বারবার বলেছি—শাসনতন্ত্র একটি সাধারণ আইন নয়, বরং তা হচ্ছে একত্র বসবাসের একটি চুক্তি। সুতরাং, সুস্থ ও সবল একটি শাসনতন্ত্র লাভ করতে হলে, তার প্রণয়ন কার্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান—উভয় অংশের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ স্থগিত করার সিদ্ধান্তটি আমি দুঃখের সঙ্গেই গ্রহণ করেছি। এই ধরনের সমস্যার বাস্তব দিকের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই। আমি এটা উপলব্ধি করলাম যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিপুলসংখ্যক সদস্যদের বাইরে রেখে যদি ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হোতো—তাহলে পরিষদই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতো; আর, স্বচ্ছন্দভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এতোদিন ধরে যতো প্রচেষ্টা চালিয়ে আসা হয়েছে, তার সবটাই ব্যর্থ হয়ে যেতো।

সুতরাং, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে একটি যুক্তিসংগত মতৈক্যে পৌঁছনোর জন্যে রাজনৈতিক নেতাদের আরও বেশী সময় দেওয়ার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো।

এই সময় দেওয়ার পর, আমি একান্তভাবে, আশা করছি যে তাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং সমস্যাটির একটি সমাধান বের করবেন।

পাকিস্তানের জনগণকে আমি একটা পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে পরিবেশ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে আমি ইতস্ততঃ করবো না। আমার নিজের সম্পর্কে, আমি আমার দেশবাসীকে আশ্বাস দিতে চাই যে আমাদের সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্য করার জন্য আমার ক্ষমতা অনুসারে সব কিছুই আমি করবো নিরপেক্ষ ন্যায়পরতার সঙ্গে—যেমন আমি বরাবর করে আসছি।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি সর্বশক্তিমান আল্লার কাছে মোনাজাত করছি: তিনি যেন আমাদের সবাইকে জাতির পিতার নির্দেশিত ঈমান, ঐক্য ও শৃংখলার কর্মপথে পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমার দেশবাসী সকলের প্রতি আমি আবেদন জানাচ্ছি: তাঁরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই চরম সংকটের দিনে পরম সংযম অবলম্বন করেন।

৬ই মার্চ, ১৯৭১

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমি যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম, আমার ১লা মার্চের ভাষণে আমি আপনাদের কাছে তার একটা বিবরণী পেশ করেছিলাম। সেই একই ভাষণে আমি আমার নিজের সম্পর্কে একথাও বলেছিলাম যে আমাদের সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে নির্বাচিত নেতাদের সাহায্য করার জন্যে আমি সম্ভব সব কিছুই করবো। আমাদের এই সাধারণ লক্ষ্য আগেও যা ছিলো, এখনও তাই রয়েছে। সে লক্ষ্যটি হচ্ছে: স্বচ্ছন্দভাবে গণতান্ত্রিক জীবনে ফিরে যাওয়া।

এই পথে আমার সর্বশেষ পদক্ষেপের কথা আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে। মার্চ মাসের দশ তারিখে ঢাকায় মিলিত হওয়ার জন্যে আমি সব পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের আহ্বানে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা খুবই নৈরাশ্যজনক। বিভিন্ন মতামতের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি ও সমন্বয় বিধানের জন্য আমি যে সত্যি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছিলাম, তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমি বিশেষভাবে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কথা বলতে চাই। সম্মেলনের খবরটি বেতারে ঘোষিত হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে এই ধারণা দিয়েছিলেন যে এধরনের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হলে তিনি তা অপছন্দ করবেন না। কাজেই তাঁর কাছ থেকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান যেমন আকস্মিক, তেমনি হতাশাব্যঞ্জক।

পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের অনেকে ৩রা মার্চ তারিখে পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করায়, পরিবেশকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে প্রতিকূল বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে নির্ধারিত তারিখে জাতীয় পরিষদের উদ্বো-

বন্যা অনুষ্ঠান হবে একটা ব্যর্থ প্রয়াস; এর ফলে হয়তো পরিষদই ভেঙ্গে যাবে। এই পরিণতি এড়ানোর উদ্দেশ্যেই আমি অধিবেশনের তারিখ স্থগিত করলাম। এর পেছনে আমার দুটি উদ্দেশ্য ছিলো : প্রথমতঃ, জাতীয় পরিষদকে রক্ষা করা এবং এই পরিষদের জন্মদানে যে জাতীয় প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে তাকে সার্থক করা। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো এই যে কিছু সময় অতিবাহিত হলে ভাবাবেগ শান্ত হবে এবং ফলপ্রসূ আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠবে।

কোন কারণে, পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করাটাকে ভুল বোঝা হয়েছে। এটা ইচ্ছাকৃত কিনা আমি জানিনে। তবে একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—এই ভুল বোঝাবুঝিকে আশ্রয় করে বিশৃংখলার শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই শক্তি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নির্দোষ জনগণ। তাদের দৈনন্দিন জীবন ভয়ংকরভাবে ব্যাহত হয়; তারা সর্বক্ষণ বিপদের মধ্যে কাল কাটায়; তাদের মধ্যে কেউ আহত হয়, কেউ বা নিহত হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করলে পরিস্থিতিকে অনায়াসেই আয়ত্তে আনা যায়, তা আমি ভালো করেই জানি। তবু, পূর্ব পাকিস্তানে আইনভংগকারীদের লুট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত করার জন্য ঠিক যতটুকু না হলে নয় শুধু ততটুকু শক্তিপ্রয়োগের জন্য আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়েছি।

পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পেছনে আমার যে দুটি উদ্দেশ্য ছিলো, তার মধ্যে একটি সফল হয়েছে—প্রথমটি, জাতীয় পরিষদ অক্ষুণ্ন রয়েছে। সমান গুরুত্বপূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যটি ছিলো—ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠান; তা এখনও সফল হয়নি। ইতিমধ্যে, নির্দোষ লোকদের প্রাণহানি চলছে। এজন্য আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু সহানুভূতি জানানোর চেয়ে বেশী কিছু করার সাধ্য আমার নেই; আর বর্তমান পরিস্থিতি আমি সৃষ্টি করিনি।

আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য করার উদ্দেশ্য আমি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম—তা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, এই দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমি এটা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি যে এই সংকটের সমাধানের জন্য আমার নিজেরই একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমি অমিসিপ্ট কাজের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে মার্চ মাসের ২৫ তারিখে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশাত্মবোধ ও গঠনমূলক মনোভাব সহকারে আমার এই সিদ্ধান্তের প্রতি সাড়া দেবেন।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে মতৈক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নেতৃ-সম্মেলনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের বলিষ্ঠতা সম্পর্কে যদি কোন রাজনৈতিক নেতার মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে—তাহলে এই প্রসংগে আমি তাদের

জানিয়ে দিতে চাই যে আইনকাঠামো আদেশের ধারাগুলোর অতিরিক্ত আর কোন আশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে না।

উপসংহারে, আমি একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে যতোক্ষণ আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান—ততোক্ষণ, যাই হোক্ না কেন, পাকিস্তানের সার্বভৌম সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান আমি অবশ্যই করবো। এবিষয়ে কোন সন্দেহ বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যেন না থাকে। এই দেশকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে এটা আশা করে; আর আমিও তাদের নিরাশ করবো না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোকের বাসভূমি পাকিস্তানকে বিনষ্ট করবে—তা আমি হতে দেবো না। পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্তব্য; আর, তারা কখনও তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়নি।

আসুন, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লার ওপর ঈমান রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাই আমাদের লক্ষ্যের দিকে—যে লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ যাতে জাতির প্রতি তাদের কর্তব্য পূর্ণভাবে পালনে সক্ষম হন, আসুন আমরা সেই পথে এগিয়ে যাই।

২৬শে মার্চ, ১৯৭১

এপ্রিলের ৬ তারিখে আমি ঘোষণা করেছিলাম ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তখন আমি আশা করেছিলাম যে ইতিমধ্যে অধিবেশন অনুষ্ঠানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি, কারণ ঘটনাচক্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। জাতি এখনও চরম সংকটের সম্মুখীন।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটি অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। এতে পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার ধারণ করে। ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছিলো। কাজেই যথাসম্ভব শীঘ্র পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য হয়ে দেখা দিলো। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সংগে আমার কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হোলো। পরে, ১৫ই মার্চ আমি ঢাকা গেলাম।

আপনারা জানেন, রাজনৈতিক সংকট দূর করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে আমি অনেকগুলো বৈঠকে মিলিত হলাম। আমি আগে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। কাজেই সেখানেও অনুরূপ পরামর্শ করার দরকার ছিলো—যাতে আমি যে সব বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে তা নিশ্চিত করতে পারি এবং একটি আপোষমূলক মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে পারি।

সংবাদপত্র ও অন্যান্য তথ্য মাধ্যমের মারফত আপনারা জানতে পেরেছেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি দেখা দিয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে আমি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় আর একদফা আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

জনাব জেড. এ. ভুট্টো ২১শে মার্চ ঢাকা পৌছুলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কয়েক দফা আলোচনা হলো।

আপনারা জানেন, আওয়ামী লীগ নেতা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছিলেন। আমাদের বৈঠকে তিনি প্রস্তাব দেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের শাসনব্যবস্থা চলবে আমার জারী করা ঘোষণার অধীনে। এই ঘোষণার দ্বারা সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে, প্রাদেশিক সরকারসমূহ গঠন করা হবে এবং জাতীয় পরিষদ শুরুতে, দুটি কমিটিতে বিভক্ত হয়ে অধিবেশনে বসবে—এর একটি কমিটি গঠিত হবে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে, আর একটি গঠিত হবে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের নিয়ে।

এই পরিকল্পনায় আইনগত ও অন্যান্য দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে আমি এটা নীতিগতভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম—কিন্তু একটি শর্তে। শর্তটি আমি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলাম। শর্তটি ছিলো এই যে এব্যাপারে প্রথমে আমি রাজনৈতিক নেতাদের সকলের মধ্যে সর্বসম্মত মতৈক্য চাই।

এরপর আমি পরিকল্পনাটি নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমি দেখলাম, তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে প্রস্তাবিত ঘোষণাটির কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না। এ ব্যবস্থা একদিকে যেমন সামরিক আইনের আওতা-ভুক্তও হবে না, আবার অন্যদিকে তেমনি জনগণের রায় বলেও গণ্য হবে না। কাজেই এর ফলে একটা শূন্যতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। তাঁরা আরও মনে করলেন যে একটি ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হলে তা বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে উৎসাহ জোগাবে। কাজেই তাঁরা মত প্রকাশ করলেন যে যদি সামরিক আইন প্রত্যাহার করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়—তাহলে তার পূর্বে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র বিল নামে একটি আইন পাশ করে তা আমার কাছে পেশ করতে হবে অনুমোদনের জন্য। আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলাম এবং তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানালাম যে তাঁরা যেন শেখ মুজিবুর রহমানকে এবিষয়ে একটি যুক্তিসংগত মনোভাব গ্রহণ করতে বলেন।

আমি নেতাদের অনুরোধ করলাম তাঁরা যেন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তাদের মত ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা যেন বলেন আপনি একদিকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস সামরিক আইনের বিলোপ চাইছেন—আবার অন্য দিকে জাতীয় পরিষদের যথারীতি অধিবেশনের মাধ্যমে জনগণের রায় দ্বারা শূন্যতা পূরণ করতেও অস্বীকার করছেন। এর ফলে শুধু বিশৃংখলাই সৃষ্টি হবে। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে,—জাতীয় পরিষদ থেকেই যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে ব্যাপারে তাঁকে রাজী করানোর চেষ্টা করতে সম্মত হলেন।

শুরু থেকেই জাতীয় পরিষদকে দুটি অংশে বিভক্ত করার জন্যে শেখ মুজিব যে প্রস্তাব দেন—তা রাজনৈতিক নেতাদের খুবই বিচলিত করলো। তাঁরা মনে করলেন, এরকম একটা প্রচেষ্টা পাকিস্তানের সংহতি পক্ষে প্রতিকূল হবে। শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও আমি—এই তিনজনের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে জনাব ভুট্টোও শেখ মুজিবের কাছে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

যে-সব রাজনৈতিক নেতারা মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসে ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে জানালেন যে মুজিব তাঁর পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন করতে রাজী নন। তিনি সত্যি যা চান, তা হচ্ছে এই যে আমি একটি ঘোষণা জারী করে সামরিক আইন প্রত্যাহার করি এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করি।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দেশদ্রোহিতামূলক কাজ করেছেন। তিনি ও তাঁর দল তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে আইনগত কর্তৃপক্ষকে অমান্য করেছেন। তাঁরা পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করেছেন, জাতির পিতার ফটোগ্রাফেরও অবমাননা করেছেন। তাঁরা একটা সমান্তরাল সরকার চালাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা অশান্তি ও বিপদের সৃষ্টি করেছেন।

আন্দোলনের নামে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ বাঙালী ভাই আর যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করেছেন—তাঁরা একটা আতংকের মধ্যে বাস করছেন। প্রাণের ভয়ে বহু লোক পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন সৈন্যবাহিনীকে নানারূপে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অপমান করা হয়েছে। প্রবল উত্তেজনার মুখেও তারা যে অগাধ সংযমের পরিচয় দিয়েছে, সেজন্যে আমি তাদের প্রশংসা করছি। তাদের শৃংখলাবোধ বাস্তবিকই প্রশংসাজনক। আমি তাদের জন্য গর্বিত।

শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আমি কয়েক সপ্তাহ আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম; কিন্তু আমি এমনভাবে অবস্থার মোকাবেলা করতে চেষ্টা করলাম যাতে আমার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ব্যাহত না হয়। এই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রতি আমার আগ্রহের জন্যই আমি একটার পর একটা বেআইনী কাজ সহ্য করে গেছি, আর একই সঙ্গে কোন রকম একটা যুক্তিসংগত সমাধানে পৌঁছনোর জন্যে আমি সম্ভব সবরকম চেষ্টা চালিয়ে গেছি। শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তির পথে আনার জন্য আমি যে চেষ্টা করেছি, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা করেছেন—তা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু তিনি কোন গঠনমূলকভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা, এমন কি আমি যখন ঢাকায় উপস্থিত, সেই সময়ও সরকারী কর্তৃপক্ষকে লংঘন করে গেছেন। তিনি যে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তিনি জানতেন, যে-কাগজে ঐ ঘোষণাটি লেখা হোতো, সেই কাগজটুকুর মূল্য পর্যন্ত ঘোষণাটির থাকতো না। আর সামরিক আইন প্রত্যাহার করার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হোতো, তখন তিনি অবাধে যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। তাঁর একগুঁয়েমি, তাঁর অবাধ্যতা, এবং যুক্তি-তর্কের পথ অবলম্বন করায় তাঁর অস্বীকৃতি—এ সবের একমাত্র অর্থ হচ্ছে—এই লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, আর তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে

চান। তিনি দেশের ঐক্য ও সংহতিকে আক্রমণ করেছেন—এ অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে। দেশাত্মবোধহীন ক্ষমতালোভী কিছু লোক দেশকে ধ্বংস করবে এবং ১২ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে—তা আমরা হতে দেবো না। মার্চ মাসের ৬ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে আমার ভাষণে আমি বলেছিলাম, পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি এ নিরাপত্তা রক্ষা করা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্তব্য। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আমি তাদের কর্তব্য পালন করতে ও সরকারের কর্তৃত্ব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করতে আদেশ দিয়েছি।

আজ দেশে যে সংকটজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সারা দেশে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বলছি—এটিকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হোলো। সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ সেন্সারশীপ আরোপ করার সিদ্ধান্তও আমি গ্রহণ করেছি। এই সিদ্ধান্তগুলো কার্যকরী করার জন্য শিগ্‌গীরই সামরিক আইন বিধি জারী করা হবে।

শেষে আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে আমার মূল উদ্দেশ্য একই থাকছে—অর্থাৎ, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। পরিবেশ উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

আমি আশা করি, পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং আমরা আবার আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো।

২৮শে জুন, ১৯৭১

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাদের সকলের জন্যেই বেদনাদায়ক। এই ঘটনাবলী ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য দুঃখ ও হতাশার কারণ হয়েছে। গত সোয়া দু' বছর ধরে আমার উদ্দেশ্য একই রয়েছে; আর তা হচ্ছে দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ও পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতি সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়া সম্পর্কে আমি সচেতন রয়েছি। এই দাবী-দাওয়া মেটানোর জন্য বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ও পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের জন্যে আমি যে পরিকল্পনা করেছিলাম তা দেশের উভয় অংশের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। তাঁরা সবাই আইনকাঠামো আদেশের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। আইনকাঠামো আদেশে এক পাকিস্তান মতবাদের আওতায় প্রদেশগুলোকে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্রকে তার কার্যনির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা দানের ব্যবস্থা ছিলো।

আমাদের কোন এক আলোচনায় আমি যখন আওয়ামী লীগের ৬-দফা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রশ্ন করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন যে এগুলো আলোচনা-যোগ্য। তিনি স্পষ্টভাবে একথাও বলেছিলেন যে শাসনতন্ত্রের সব প্রধান বিষয়গুলো পরিষদের বাইরে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসা করা হবে। এটাই

রাজনীতিবিদদের সনাতন রীতি। নির্বাচনের পর, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মতৈক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যখন রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকের জন্য চেষ্টা করলাম—তখন একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মুজিব তার দাবীতে কোন পরিবর্তন করতে রাজী নন; আর তার দাবীটা ছিলো—সোজা কথায় বলতে গেলে—বিচ্ছিন্নতার দাবী। বারবার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এসে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এটাও তাঁর দুরভিসন্ধির আর একটি পরিচয়। সমগ্র দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে দেশাত্মবোধ সহকারে দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিলো না। তিনি আগে থেকেই মন স্থির করেছিলেন যে তিনি দেশকে দুটি অংশে বিভক্ত করবেন—কৌশলে হলে ভালো, না হলে, বল প্রয়োগ করে।

২৬শে মার্চ তারিখে আমার ভাষণে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে ১৫ই মার্চ থেকে আমার ঢাকায় অবস্থানকালে শেখ মুজিব ও তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে আমার কয়েক দফা বৈঠক হয়েছিলো। একদিকে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর অন্য দিকে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা বলপ্রয়োগের দ্বারা চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমাদের আলোচনা যখন প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তখন একথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে শেখ মুজিব ও তাঁর উপদেষ্টাদের উদ্দেশ্য ছিলো—এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোন সমঝোতায় আসা নয়, বরং কোন প্রকারে আমার কাছ থেকে একটি ঘোষণা আদায় করা—যার ফলে জাতীয় পরিষদ দুই পৃথক গণপরিষদে বিভক্ত হবে, ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি কনফেডারেশনের জন্ম হবে, এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর দেশে পূর্ণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে। তাঁরা চেয়েছিলেন যে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁরা বাংলা দেশ নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। বলা বাহুল্য, তাহলে জাতির পিতার প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান খতম হয়ে যেতো।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিবেকহীন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিরা দেশকে ভাঙ্গনের প্রান্ত সীমায় এনে ফেলেছিলো। উপমহাদেশের মুসলমানদের অক্লান্ত সংগ্রামের ও সাফল্যের প্রতীক আমাদের প্রিয় বাসভূমি পাকিস্তান কঠিন বিপদের সামনে পড়লো। তিন সপ্তাহের বেশী সময় ধরে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর চক্রীদলের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ঘটলো ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নরহত্যা।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভোট দিয়েছিলেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য—দেশকে বিভক্ত করার জন্যে নয়। জাতীয় সংহতির খাতিরে আদান-প্রদানের মনোভাব নিয়ে মত-বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে এগিয়ে আসার পরিবর্তে—বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের কোন কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বেছে নিলো অবাধ্যতা, গোলযোগ ও বিচ্ছিন্নতার পথ। একটি গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরীর প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের কাজে সাহায্য করার জন্য আমি যতো চেষ্টা করেছিলাম তার সবটাই ব্যর্থ করে দিলো বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা। একদিকে তারা আপোষহীন, অনমনীয়

মনোভাব অবলম্বন করে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করলো—অন্যদিকে তারা প্রকাশ্যভাবে সরকারকে অবজ্ঞা করে তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ তীব্রতর করলো। যে দেশের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের হাজার হাজার ভাই প্রাণ দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক মাথা পেতে নিয়েছে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা—সেই দেশের অস্তিত্ব চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হোলো। এই পরিস্থিতিতে, আমি সেনাবাহিনীকে আদেশ দিলাম সরকারের কর্তৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও সশস্ত্র বিদ্রোহের কবলে পড়ে দেশকে ধ্বংস হতে দিতে কোন সরকারই পারে না।

জাতির প্রতি আমার বিগত ভাষণে আমি আপনাদের আশ্বাস দিয়েছিলাম যে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর। আমি আপনাদের একথাও বলেছিলাম যে এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে আমি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। তবে প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে নিচ্ছি যে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বহু অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করা হয়েছে। গুটিকয়েক পথভ্রান্ত লোকের দুষ্কৃতির জন্য গোটা নির্বাচনের সাফল্যকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আমি নিষিদ্ধ করেছি। কিন্তু বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নব-নির্বাচিত এম.এন.এ. ও এম.পি.এ.-রা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের আসনে বহাল রয়েছেন। তবে আমি বলতে চাই যে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অংশ নিয়েছে, আইন অমান্য করেছে অথবা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেছে—তারা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে। অযোগ্য সদস্যদের সংখ্যা ঠিক কতো হবে—তা এখনও চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধানের পর অযোগ্য সদস্যদের একটি তালিকা প্রকাশিত হবে। এই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর শূন্য আসনগুলো যথারীতি উপ-নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হবে।

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে যারা দলের বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, এবং যারা এই নীতির অধীনে কোন অপরাধমূলক কাজ করেননি, অথবা যারা তাদের পাকিস্তানী ভাইদের ওপর কোন অত্যাচার-উৎপীড়ন করেননি—তাঁদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন এগিয়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনে তাঁদের ভূমিকা পালন করেন।

পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে একটি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সম্ভব নয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ইতিহাস খুব উৎসাহজনক বা আনন্দজনক নয়। একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দুটি গণপরিষদের ন' বছর সময় লেগেছে—১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। দেশের নেতারা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য অযথা দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন—অথচ জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতি কোন দৃষ্টি না দিয়ে সেগুলোকে অবহেলা করেছেন। তবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এটা যে একে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন রকমের আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণতার মনোভাব গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শোচনীয়

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দিয়েছে—যা জাতির অস্তিত্বের প্রতি আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে যে শাসনতন্ত্রটি প্রণীত হোলো—তাতে ছিলো একই সঙ্গে কতকগুলো পরস্পর-বিরোধী আইন। এর ফল দাঁড়ালো এই যে শাসনতন্ত্রটি বেশীদিন চলতে পারলো না এবং দেশ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত সামরিক শাসনের অধীনে থাকলো। এরপর দেশ শাসিত হয় একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে। এ শাসনতন্ত্রটি শুরু থেকেই জনগণের অপ্রিয় ছিলো। এর কারণটা সকলে ভালো করেই জানেন। ১৯৬৯ সালে এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিলো। কাজেই আমি মনে করলাম যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া উচিত জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা কিন্তু অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্যে আমি ১২০ দিনের একটি সময়-সীমা নির্ধারণ করলাম। আমি আমার আইনকাঠামো আদেশে কতকগুলো মূলনীতিও নির্ধারণ করলাম। আমি ১২০ দিনের যে সময়-সীমা ধার্য করেছিলাম—তা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই হয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও আমি পরামর্শ করেছিলাম। আশা করা গিয়েছিলো যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন এবং শাসনতন্ত্রের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষদের বাইরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি মতৈক্য পৌঁছবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বেআইনী-ঘোষিত আওয়ামী লীগের দেশাত্মবোধহীন ও আপোষহীন মনোভাব আমার সমস্ত আশা ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিলো।

এই পটভূমিকায় এবং বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার সামনে মাত্র একটি পথই আছে—তা হচ্ছে: একটি বিশেষজ্ঞ দলকে দিয়ে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করে নেওয়া। এই শাসনতন্ত্রটি হবে জাতীয় পরিষদের সংশোধন সাপেক্ষ। সংশোধনী পদ্ধতি শাসনতন্ত্রেই উল্লিখিত থাকবে। অনেকগুলো শাসনতন্ত্র তীক্ষ্ণভাবে পর্যালোচনা করে তারই ভিত্তিতে এই শাসনতন্ত্রটি রচিত হবে। গত দু' বছর ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাও হবে এই শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ। আমি ইতিমধ্যেই একটি শাসনতন্ত্র কমিটি নিয়োগ করেছি। তাঁরা একটি খসড়া প্রস্তুত করছেন। খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেলে, তার ধারাগুলো সম্পর্কে আমি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার আলোচনা ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্রটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের জন্য কয়েকটি নির্দেশিকা ১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশেই উল্লিখিত রয়েছে। প্রথমতঃ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ হবে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ—যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। এটা হবে সত্যিকারভাবে "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান"-এর শাসনতন্ত্র। আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশে পূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিও এতে থাকবে। এ শাসনতন্ত্রটি হবে একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্র। ফেডারেল শাসন

তন্ত্রের সবগুলো বৈশিষ্ট্য এতে অবশ্যই থাকবে। আইনকাঠামো আদেশে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে প্রদেশগুলো পাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন, অর্থাৎ—সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনবিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। কিন্তু, পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও সীমানাগত সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ফেডারেল সরকারের হাতেও থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণ আইনবিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা।

এমন কোন রাজনৈতিক দল বা কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় নয়—জাতীয় সংহতির স্বার্থে তেমন দলকে নিষিদ্ধ করলেই ভাল হয় বলে আমি শাসনতন্ত্র কমিটিকে বলেছি। এ ছাড়া, একটি দলের মধ্যে দুটি, তিনটি, বা চারটি করে উপদল থাকাও চলবে না। আমার আশা এই যে, যা কিছু আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে জটিল, দুর্বল, নিরাপত্তাহীন ও দেশপ্রেম বিমুখ করতে পারে—এমন সব কিছুকেই আমাদের নির্মূল করতে হবে। জনগণ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাতে গঠনমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে শাসনতন্ত্রে তার নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকতে হবে। শাসনতন্ত্রটি সামগ্রিকভাবে জাতির সেবায় নিয়োজিত হবে—কোন ব্যক্তিবিশেষের বা গ্রুপ বিশেষের সেবায় নিয়োজিত হবে না। এ শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে—যাতে প্রদেশগুলো ঠিক পথ ধরে তাদের নিজস্ব উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারে—অথচ কেন্দ্রের শক্তি ও সামগ্রিকভাবে জাতির সংহতিও ব্যাহত না হয়। আমি এখানে একথাটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে এ শাসনতন্ত্র বলবৎ হবে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে। এর পূর্বেই আইনকাঠামো আদেশের অধীনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এতোক্ষণ আমি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বললাম। এখন আমি ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আমার পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমি আগেই বলেছি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনগুলো পূরণের জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনগণের মনোভাব বিবেচনা করে আমি নিশ্চিত ধারণা করেছি যে এইসব উপ-নির্বাচনের নির্বাচনী-অভিযান আইনকাঠামো আদেশে বর্ণিত ধারার অধীনেই চলবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন প্রচারণা কেউ সহ্য করবেন না। আমার মতে নির্বাচনী অভিযান সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। উপনির্বাচন শেষ হলে, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অধিবেশন যথাসময়ে আহ্বান করা হবে, এবং দেশব্যাপী জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ গঠন করা হবে। জাতীয় পরিষদকে গণপরিষদ হিসেবে কাজ করতে হবে না। শপথ গ্রহণের পরই, জাতীয় পরিষদ হবে আমাদের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ।

জাতি সম্প্রতি একটা শক্ত আঘাত পেয়েছে। কাজেই আমি স্থির করেছি যে জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ কিছুদিনের জন্য সামরিক আইনের আওতাভুক্ত থাকবে। ফলতঃ সামরিক আইন বর্তমান আকারে সক্রিয় থাকবে না। কিন্তু দেশের কোন অংশেই আমরা কোন বিশৃঙ্খলা ঘটতে দিতে পারি না। আর, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সরকারের হাত মজবুত রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশে যথাসময়ে সংশোধিত হবে।

এখন আমি এই পরিকল্পনার সময়-সূচী সম্পর্কে আপনাদের কাছে কিছু বলতে চাই। গোটা পরিকল্পনার সব কাজ যে একসঙ্গে এখনই শুরু হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। কারণ দেশে একটা যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না এলে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু অন্যদিকে, পরিকল্পনার কাজ শুরু হতেও অযথা বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। স্বাভাবিকতা বলতে বোঝায়—আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা; দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস; এবং কিছুটা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

আমি শুনেছি যে এই মর্মে একটা মত প্রকাশিত হচ্ছে যে সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত নয়। আমি এর সঙ্গে একমত নই। কারণ এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব। যাঁরা এই মত প্রকাশ করেছেন তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিকের কথা বিবেচনা করেননি, তা হচ্ছে এই যে জাতীয় প্রশাসনে জনগণের পূর্ণ অংশ গ্রহণ ছাড়া কোন দেশের জাতির জীবনে কখনো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি আমরা একটা মৌলিক আইন-শৃঙ্খলা কাঠামো গড়ে তুলতে পারলে এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন অঙ্গকে কিছুটা শক্তিশালী করতে পারলেই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতি যে আকার ধারণ করতে পারে তা বিবেচনা করে আমি এই আশা ও বিশ্বাস পোষণ করছি যে এক মাস বা অনুরূপ সময়ের মধ্যে আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। ঠিক কতটা সময় লাগবে তা স্বভাবতঃই নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট সময়ে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতির ওপর। আমি এইমাত্র আপনাদের কাছে আমার যে পরিকল্পনার কথা বললাম সেটাই আমাদের দেশের সংহতি ও কল্যাণের উপায় বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই পথেই আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

আইনকাঠামো আদেশ, ১৯৭০

প্রেসিডেন্টের আদেশ নম্বর ২ (১৯৭০ সাল)

যেহেতু,

১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণে, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন;

এবং যেহেতু,

১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর, জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে, তিনি এই সঙ্কল্পের পুনরাবৃত্তি করেন এবং ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত করার জন্য সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে;

এবং যেহেতু,

এর পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের ভোট গ্রহণও ১৯৭০ সালের ২২শে অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে;

এবং যেহেতু,

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণ-প্রতিনিধিদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটার-তালিকা তৈরীর জন্য ভোটার-তালিকা আদেশ (১৯৬৯)-এ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু,

এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিষদ গঠন এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

সুতরাং,

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের ঘোষণা-মোতাবেক, এবং এই ঘোষণায় প্রদত্ত সব ক্ষমতাবলে, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিম্নবর্ণিত আদেশ জারী করেছেন:

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা এবং আদেশ বলবৎ হওয়ার তারিখ

১। (১) এই আদেশ আইনকাঠামো আদেশ, ১৯৭০ সাল বলে অভিহিত হবে।

(২) সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের নির্দেশিত তারিখে এই আদেশ বলবৎ হবে।

অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য

২। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র-আদেশ, পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র কিংবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে এই আদেশের বিপরীত কিছু থাকলেও তা অগ্রাহ্য করে এই আদেশ বলবৎ হবে।

৩। (১) এই আদেশে, বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ না হলে,

(ক) "পরিষদ" অর্থ হবে এই আদেশে উল্লিখিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ কিংবা কোন প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ;

(খ) "কমিশন" অর্থ হবে ৮ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(গ) "কমিশনার" অর্থ হবে ভোটার-তালিকা আদেশ, ১৯৬৯ সাল (১৯৬৯ সালের P.O নম্বর ৬)-এর অধীনে নিযুক্ত কিংবা নিযুক্ত বলে গণ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার;

(ঘ) "ভোটার-তালিকা" অর্থ হবে ভোটার-তালিকা আদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের P.O নম্বর ৬) এর অধীনে তৈরী ভোটার-তালিকা;

(ঙ) "সদস্য" অর্থ হবে কোন পরিষদের সদস্য;

(চ) "স্পীকার" অর্থ হবে জাতীয় পরিষদের স্পীকার; এবং

(ছ) "কেন্দ্র-শাসিত উপজাতীয় এলাকা" কথাটি পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ (বাতিল) আদেশ, ১৯৭০-এ ব্যবহৃত অর্থেই প্রযুক্ত হবে।

(২) এই আদেশ বলবৎ হওয়ার সময় পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত এলাকা-গুলোর প্রসঙ্গে, কোন "প্রদেশ" কিংবা "প্রাদেশিক পরিষদ"-এর উল্লেখ করা হলে তার অর্থ হবে, যথাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ (বাতিল) আদেশ, ১৯৭০-এর অধীনে গঠিত কোন একটি নতুন প্রদেশ এবং এ-রকম প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ।

জাতীয় পরিষদের গঠন

৪।(১) পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। এর মধ্যে ৩০০ হবে সাধারণ আসন এবং ১৩টি হবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

(২) ১৯৬১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক জাতীয় পরিষদের আসন-সংখ্যা ১ নম্বর তালিকায় বর্ণিত প্রদেশসমূহ এবং কেন্দ্র-শাসিত উপজাতীয় এলাকাসমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে।

(৩)(১) নম্বর ধারায় একজন মহিলাকে একটি সাধারণ আসনে নির্বাচনের অযোগ্য গণ্য করা হয়নি।

প্রাদেশিক পরিষদসমূহের গঠন

৫। (১) প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হবে। ২ নম্বর তালিকা মোতাবেক প্রতিটি প্রদেশে সাধারণ আসন ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যাই হবে সেই প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য-সংখ্যা।

(২)(১) নম্বর ধারার একজন মহিলাকে একটি সাধারণ আসনে নির্বাচনের অযোগ্য গণ্য করা হয়নি।

নির্বাচনের রীতি

৬। (১) নিম্নে (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়া, সাধারণ আসনসমূহের সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে আইনানুসারে নির্বাচিত হবেন।

(২) প্রেসিডেন্ট আইন জারী করে, কেন্দ্র-শাসিত উপজাতীয় এলাকাসমূহের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর, যত শিগ্‌গীর সম্ভব, সাধারণ আসনে নির্বাচিত একটি প্রদেশের জাতীয় পরিষদ-সদস্যরা জাতীয় পরি-ষদের মহিলা-সংরক্ষিত আসনের জন্য সেই প্রদেশের মহিলা-সদস্যদেরকে আইনানুসারে নির্বাচিত করবেন।

(৪) একটি প্রাদেশিক পরিষদের মহিলা-সংরক্ষিত আসনগুলোর মহিলা সদস্যরাও সেই পরিষদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যসমূহ কর্তৃক আইন অনুসারে নির্বাচিত হবেন।

আকস্মিক আসন খালি

৭। জাতীয় পরিষদের কোন আসন খালি হলে, আসন খালি হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে তা পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন

৮। একটি পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন যাতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিরা থাকবেন:—

(ক) কমিশনার—যিনি কমিশনের চেয়ারম্যান থাকবেন; এবং

(খ) অন্য দু'জন সভ্য—যাঁদের প্রত্যেকেই হচ্ছেন হাইকোর্টের একজন স্থায়ী বিচারপতি।

সদস্যপদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৯। (১) নিম্নবর্ণিত (২) নম্বর ধারাসাপেক্ষে কোন ব্যক্তি একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচনের যোগ্য এবং সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন, যদি

(ক) তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হন;

(খ) তাঁর বয়স নমপক্ষে ২৫ বছর হয়।

(গ) যে প্রদেশ, কিংবা কেন্দ্র-শাসিত যে-উপজাতীয় এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হতে চাচ্ছেন তার অন্তর্গত যে-কোন নির্বাচনী এলাকার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসেবে নির্বাচনের এবং সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন যদি, (ক) তিনি মানসিক অসুস্থতায় ভোগেন এবং কোন যথাযোগ্য আদালত তাঁকে মানসিক রোগগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেন।

কিংবা,

(গ) তিনি ঋণে দেউলিয়া হন এবং আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর ১৩ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে; কিংবা,

(গগ) তিনি কোন অপরাধে দণ্ডিত হয়ে যে-কোন মেয়াদের জন্য নির্বাসিত হন, কিংবা নমপক্ষে দু বছরের জন্য কারাদণ্ড থাকেন, এবং তার মুক্তির পর পাঁচ বছর অথবা, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি—অনুসারে ৫ বছরের কম কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে। কিংবা,

(ঘ) তিনি ১৯৬৯ সালের পয়লা আগষ্টের পর প্রেসিডেন্টের উজীর পরিষদের সদস্য হয়ে থাকেন এবং তাঁর উজীর-পদের অবসানের পর ২ বছর অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ২ বছরের কম কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে বা,

(ঙ) বেতন বা ফিসের মাধ্যমে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত আংশিক-সময়ের চাকরী ছাড়া পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকুরে হন।

বা

(চ) অসদাচরনের জন্য পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়ে থাকেন এবং বরখাস্ত হবার পর ৫ বছর, কিংবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ৫ বছরের কম কোন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে।

বা

(ছ) তিনি পাকিস্তানের কোন সরকারী চাকুরের স্বামী বা স্ত্রী হন।

বা

(জ) তিনি, নিজে কিংবা তাঁর পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে, বা তাঁর স্বার্থে বা তাঁর নামে বা একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসেবে সরকারকে মাল সরবরাহের বা সরকারের গৃহীত কোন ঠিকা বাস্তবায়নের কিংবা সরকারের পক্ষে কোন গাড়ি-সম্পাদনের কোন ঠিকায় শরীক থাকেন। সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যেকার ঠিকার ক্ষেত্রে এই অযোগ্যতা প্রযোজ্য নয়।

উল্লেখ থাকে যে, (জ) উপধারায় বর্ণিত অযোগ্যতা প্রযোজ্য নয়

(i) যেখানে ঠিকার অংশ কিংবা স্বার্থ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বা ক্রম-পরম্পরায় বা কোন উইল অনুসারে executor কিংবা administrator হিসেবে পেয়েছেন এবং তা পাওয়ার পর এখনো ৬ মাস কিংবা কোন